ভাদরের চারি
আশ্বিনের
চারি কলাই
রোব যত
পারি

চাষের কথা

ভাদ্রে করে
কলার
রোপণ
সবংশে
সরিল
রাবণ

বর্ষ ১৪ ।। সংখ্যা ৩ ।। মে-জুন ২০১১ ।। ১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় - ১৪১৮

খামারসারের সুফল

নতুন পাতা

তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলির মঙ্গুলম একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম। গ্রামের সঙ্গে কোনো বাস যোগাযোগ নেই। গ্রামের পুরুষরা অন্যের জমিতে মুনিশ খাটে, আর মেয়েরা বিড়ি বাঁধে। কয়েকবছর আগে অব্দিও এখানে সব পরিবারেই সারের দোকানে গড়ে হাজার টাকা দেনা থাকত।

যে বছর বর্ষা হত না, ফসল ফলত না সেই সেই বছরে এই ধার মেটানো খুব কঠিন হত। ফলে সুদ যেত আরো বেড়ে। পরের বছরে শোধ করার টাকার পরিমাণ হয়ে যেত দ্বিগুণ। সারের দোকানদার ধারে না দিলে এমনকি লংকা-টমেটোও জমিতে করা যেত না।

ওখানে ২০০৯-২০১০ নাগাদ 'স্যান্ডস' বলে একটা সংগঠন কাজ শুরু করে। স্যান্ডস ওখানে কৃষকদের খামারসার-

গাদাসার তৈরি শেখায়। খামারসার মানে ফার্ম ইয়ার্ড ম্যানিওর। মঙ্গুলমের ১ হাজার কৃষক এই প্রশিক্ষণ পায়। তবে কেবল মঙ্গুলম নয়, নানগুনেরি ও রাধাপুরম তালুকের ৬টি গ্রামের চাষিরাও এই সার ব্যবহার করছে বিপুল হারে।

এই খামারসার ব্যবহারে ধানে একর প্রতি খরচ বেশ কমেছে। আগে এইজন্য সার-তেলে বছরে খরচ হত ১ হাজার ৫০০ টাকা। এখন তা ৫০০ টাকাতেই হয়।

ভাষাবদল : অনিকেত

যোগাযোগ :

স্যান্ডস

প্রযত্নে অধিকর্তা জে পি সামরাজ
সুবিশেষপুরম (ইভামোজি হয়ে) ৬২৭৬৫২
দূরভাষ : ০৪৬৩৭২৭৮১৭৩
মোবাইল :৯৬৫৯৩১৮৬০৯
ইমেল: sand_suviseshapuram@yahoo.com

হিন্দু ১০ জুন ২০১০

অন্য পাতায়

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব : ২
ধানচাষে বলন পদ্ধতি : ৬
সৌরলন্ঠনে পড়াশোনা : ৭

নিষিদ্ধ কীটনাশক

জানেন কি

সম্প্রতি এন্ডোসালফান নামের কীটনাশক বাতিল করার জন্য আমাদের দেশসহ সারা পৃথিবীতে আন্দোলন শুরু হয়েছে। বর্তমানের সব থেকে বেশি ক্ষতিকর কীটনাশক হল এন্ডোসালফান। এই কীটনাশকটি মানুষের স্নায়ু ও জননেন্দ্রিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এতো গেল এন্ডোসালফানের কথা। এছাড়া আরও ৩২টি কীটনাশক আছে যেগুলির ব্যবহার সরকার বাতিল করেছে। কিন্তু বাজারে এর অনেকগুলিরই রমরম করে বেচাকেনা চলছে। তবে একই কীটনাশক নানা কোম্পানি তৈরি করে এবং বাজারে নানা নামে বিক্রি করে। তবে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক কীটনাশকের মোড়কের গায়ে রাসায়নিক নাম লিখতেই হয় কোম্পানিগুলিকে। সেক্ষেত্রে এই নাম দেখে কীটনাশক কেনা উচিত। এখানে কীটনাশকগুলির রাসায়নিক নাম লেখা হল।

বাতিল কীটনাশকের তালিকা :

১। অলড্রিন
২। বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড
৩। ক্যালসিয়াম সায়ানাইড
৪। ক্লোরোডেন
৫। কপার অ্যাসিটোরসেনাইট
৬। ডাই রোমোক্লোরোপ্রপেন
৭। এনড্রিন
৮। মিথাইল মার্কারি ক্লোরাইড
৯। ইথাইল প্যারাথিয়ন
১০। হেপ্টাক্লোর
১১। মেনজোন
১২। নাইট্রোফেন
১৩। প্যারাকুয়েট ডাইমিথাইল সালফেট
১৪। পেন্টাক্লোরো নাইট্রোবেনজিন
১৫। পেন্টাক্লোরো ফিনল
১৬। ফিনাইল মার্কারি অ্যাসিটেট
১৭। সোডিয়াম মিথেন আরসোনেট
১৮। টেট্রা ডাইফন
১৯। টেক্সাফেন
২০। অল্ডিকার্ব
২১। ক্লোরোবেনজাইলেট
২২। ডাইঅ্যালড্রিন
২৩। মেটালিক হাইড্রোজাইড
২৪। ইথিলিন ডাই ব্রোমাইড
২৫। ট্রাইক্লোরো অ্যাসেটিক অ্যাসিড
২৬। মনক্রোটফস (সবজির ক্ষেত্রে)
২৭। নিকোটিন সালফেট
২৮। ক্যাপটাফল ৮০% গুঁড়ো
২৯। মিথোমিল ২৪%
৩০। মিথোমিল ১২৫%
৩১। ফসফোমিডন ৮০%
৩২। কার্বোফুরান ৫০%

সম্পাদকীয়

রাজনীতির শুভবুদ্ধি ?

জিন-কারিগরিজাত শস্য চাষের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ মুখর হয়েছে। তারা প্রতিবাদী সমন্বয় গড়েছে। এই সমন্বয় এই শস্যের প্রচলন-প্রতিরোধে ধারাবাহিক কার্যক্রম নিয়েছে। কিন্তু এই শস্য নিয়ে কোনো রাজনৈতিক স্বর সরব এমন আমরা দেখছি না। কোনো চিন্তাদর্শের কোনো কৃষক সমিতি এই শস্য নিয়ে সোচ্চার নয়। যদিও জিন-কারিগরিজাত শস্য এলে কৃষি ও কৃষক উভয়ক্ষেত্রেই সমূহ সর্বনাশ, সর্বস্ব গিয়ে কৃষকের জন্য পড়ে থাকবে কেবল পরাধীনতা।

বাংলার বহুপন্থার সহস্রাধিক দলের কারোরই এই নিয়ে কোনো অবস্থান নেই। অথচ রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে এই সমস্যা উত্থাপিত হলে তা অন্য মাত্রা পেত, জনমানস ও সরকারের উপর প্রভাব পড়ত সহজে। আমাদের রাজনীতি-চর্চায় সরকারের প্রকল্প -পরিকল্পের অসফলতা বা গণতন্ত্র-গ্রাসী বিধিবিধানই সর্বদা একমাত্র আলোচ্য হয়ে এসেছে। আর গ্রাসাচ্ছাদনের তাৎক্ষণিকতা নির্ভর এই অবস্থান জনমানসকেও টানতে পেরেছে সহজে। এই প্রত্যক্ষ-অর্থনীতি-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক সক্রিয়তা মনে হয় আমাদের ঐতিহ্যের অভ্যাস।

কিন্তু এই অভ্যাসের আগল ভাঙা প্রয়োজন। নাহলে আমাদের কৃষি-স্বাস্থ্য-প্রকৃতি-পরিবেশ তথা খাদ্য-অর্থনীতি অন্যের কব্জায় চলে যাবে। আমরা বুঝতেও পারব না। শুধু একদিন জানতে পারব যে, আমরা 'নিজভূমে পরবাসী' হয়ে গেছি।

শুভেচ্ছাসহ

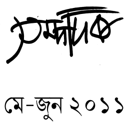

মে-জুন ২০১১

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব কেন পূর্ব ভারতে

কল্যাণ রুদ্র

পরিবেশ-প্রকৃতির সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ আসলে ক্ষমতা ও আধিপত্যের পরম্পরা—শাসিতের উপর শাসকের বিধিনিষেধের পরিকল্পিত প্রয়োগ। ঐতিহাসিক ডোনাল্ড ওরস্টার তাঁর *রিভারস অব এম্পায়ার* গ্রন্থে লিখেছেন—জলসম্পদের উপর দখলদারি আসলে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কৌশল। এ সত্য সকলেই জানেন, শুখা এলাকার মানুষের কাছে জল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বেঁচে থাকার উপাদান। জল প্রকৃতিজ, রাজনৈতিক সীমা-নিরপেক্ষ এবং গতিশীল। জল সম্পদ বলেই ভুবনীকরণের উদাত্ত আহ্বানে আজ পণ্য আর বাকি সব আগ্রাসনের রাজনীতির মতোই এই প্রাকৃতিক সম্পদকে ঘিরেও চলছে দখলের লড়াই। গঙ্গার জলের ভাগাভাগি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মতান্তর চলছে সেই ১৯৭০-এর দশক থেকে। কাবেরী নদীর জল নিয়ে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর বিবাদ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে মধ্যস্থতা করতে হয়েছে। শুখা মরশুমে গঙ্গার জল টেনে নেওয়া হয় উত্তরপ্রদেশের কৃষিজমিতে, শুকিয়ে যায় গঙ্গার নিম্ন-প্রবাহ। ডিভিসি-র জল মূলত পান বর্ধমানের কৃষকরা। বঞ্চিত হুগলি ও হাওড়া জেলার কৃষকরা। এইভাবেই চলছে জল নিয়ে বিবাদ। গত শতাব্দীতে তেলের জন্য যুদ্ধ হয়েছে, এই শতাব্দীতে জলের জন্য যুদ্ধ হবে—এমন আশঙ্কা বিশ্বব্যাঙ্কের। পৃথিবী ক্রমশ আরোও উষ্ণ হচ্ছে, অনেক এলাকায় জলের সংকট আরো গভীর হচ্ছে। এই সময় শুরু হয়েছে জলসম্পদ লুণ্ঠনের নতুন কৌশল-প্রকৌশল—যার নাম ভারচুয়াল ওয়াটার ট্রেড। আমেরিকা-ব্রিটেনের মতো দেশ চাইছে যেসব ফসল উৎপাদনে বেশি জল লাগে সেগুলির চাষ হোক তৃতীয় বিশ্বে, তারপর রফতানি হোক উন্নত দুনিয়ায়। ফসলের সঙ্গেই রফতানি হয়ে যাবে জলসম্পদও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এক টন সাধারণ চাল বিদেশে রফতানি হলে তার সঙ্গে ২৮.৫০ লক্ষ লিটার জলও চলে যায়। সেচের যে জল আমরা মাটির নীচ থেকে টেনে তুলছি তা অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ হচ্ছে না। মাটির নীচের জল আমাদের সর্বোত্তম উত্তরাধিকার। অলক্ষেই লুঠ হয়ে যাচ্ছে সেই সম্পদ। শুকিয়ে যাচ্ছে বহু নদী—যা হাজার বছর ধরে আমাদের সভ্যতাকে লালন করেছে। এ সব হচ্ছে উন্নয়নের বকলমে। তবে মুখ আর মুখোশ চেনা মুস্কিল।

অন্ন চিন্তা

এই লুণ্ঠন শুরু হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকে, প্রথম সবুজ বিপ্লবের সময় থেকে। প্রথম সবুজ বিপ্লব ছিল উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বড় জলাধার—খালের নেটওয়ার্ক, মাটির নীচ থেকে জল তোলার প্রকৌশল ইত্যাদি মিলে একটি প্যাকেজ। উল্লেখ্য ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ২০০৭-০৮ সালের মধ্যে ভারত খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ধীরে ধীরে পাঁচ কোটি টন থেকে ২৩ কোটি টন অতিক্রম করেছে। ওই সময় ভারতে সেচসেবিত এলাকার ব্যাপ্তি ২.২ কোটি হেক্টর থেকে বেড়ে ১০ কোটি হেক্টর অতিক্রম করেছে। সুতরাং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কৃতিত্ব কতটা সেচ ব্যবস্থার আর কতটা উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। জানা যায় নি ভূ-জীববৈচিত্রের ক্ষতির পরিমাণ। উল্লেখ্য—ওই সময়ের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫২২ কিলোগ্রাম থেকে বেড়ে ১৮৬০ কিলোগ্রাম হয়েছে। কিন্তু উৎপাদন ৩.৫৬ গুণ বাড়াতে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ বেড়েছে ৩৪৪ গুণ।

এমন অবস্থায় ভারত সরকারের ২০১০-১১ সালের বাজেটে পূর্ব ভারতের ৬টি রাজ্যে দ্বিতীয় বা চিরসবুজ বিপ্লবের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা। সরকার বলছে—India needs another green revolution if it wants to position itself as one of the world's major food exporters and not merely content feeding 17 percent of the global population on only 3 per cent of the world's arable land.

এবার আমরা আস্তে আস্তে প্রসঙ্গে যাব প্রথমেই প্রথম ও দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে মিল ও অমিল খুঁজে নেওয়া যাক :

	প্রথম সবুজ বিপ্লব	দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব
অঞ্চল	উচ্চ-গঙ্গা সমভূমি [হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ]	নিম্ন-গঙ্গা সমভূমি [বিহার, পশ্চিমবঙ্গ,ঝাড়খন্ড, ওড়িশা]
প্রযুক্তি	উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বড় বাঁধ ও মাটির নীচের জল-নির্ভর সেচ	জিন-পরিবর্তিত বীজ
নেপথ্যের বহুজাতিক	রকফেলার ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন	মনস্যান্টো, ওয়ালমার্ট আর্চার ড্যানিয়েলস মিডল্যান্ড
বৈশিষ্ট্য	দেশজ বীজের বদলে উচ্চফলনশীল বীজ	জিন-পরিবর্তিত বীজ
ফল —সম্ভাব্য ফল	ভূ-জীববৈচিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি	জিন-পরিবর্তিত ফসলের সঙ্গে পরাগ মিলনে দেশজ ফসল ধ্বংস। কৃষকের বীজের অধিকার হারানো। জীব বৈচিত্রের অবলুপ্তি। জলসম্পদ লুণ্ঠন। বহুজাতিকের একাধিপত্য

সেচের চালচিত্র :

দশম পরিকল্পনায় ভারতের সেচ এলাকা যতটা বৃদ্ধি পাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল বাস্তবে তা হয়নি। লক্ষ্য ও বাস্তবের মধ্যে ফারাক থেকে গেছে প্রায় ৩৬% অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার ৬৪% জমিতে সেচের জল পৌঁছেছে। আরো যা নজর করার তা হল, ভারত সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য দেশের প্রায় ১৪ কোটি হেক্টর জমিতে সেচের জল পৌঁছে দেওয়া, দশম পরিকল্পনায় এই লক্ষ্য ছিল ১০.২৮ কোটি হেক্টর জমি। কিন্তু দেওয়া গেছে মাত্র ৮.৭২ কোটি হেক্টর জমিতে। এই জমির প্রায় ৪৭% এলাকায় সেচ করা হয় মাটির নীচের জল তুলে। দু-কোটির বেশি নলকূপ এই জলের জোগান দিচ্ছে। সরকারি প্রতিবেদনে দেশ জুড়ে যে বেসরকারি সেচ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার হিসেব থাকে না। এদেশে সারা বছরে উৎপাদিত মোট খাদ্যশস্যের ১৫%-র ফলনের জন্য ফি বছর মাটির এমন গভীর স্তর থেকে জল তুলে আনা হয় যা সহজে পূরণ হবার নয়। ইতিমধ্যেই দেশের ১৫% ভূগর্ভ-জলাধার বিপন্ন, আগামী ২৫ বছরে দেশের ৬০% মাটির নীচের জলাধার শুকিয়ে যাবে।

বড় বাঁধের লাভক্ষতি :

ভারতীয়দের চোখে নদী হল মা, যার পলি ও জল এদেশের কৃষির মূল উপাদান। আপাত-বিধ্বংসী বন্যাও এখানে বয়ে আনে সৃষ্টির বার্তা। কৃষিজমিতে নতুন পলি ফেলে বন্যার জল নেমে গেলে কৃষকরা চাষ শুরু করতেন, কোনো রাসায়নিক সার ছাড়াই প্রচুর ফলন হত। ব্রিটিশরা আসার পর এদেশের নদী-জল-পলির এই আন্তঃ সম্পর্কটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল নদীর পাড় বরাবর বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে সেচ-ব্যবস্থার প্রসার। স্বাধীনতার পর শুরু হল বড় বাঁধ নির্মাণের নতুন যুগ। বড় বাঁধের লাভক্ষতি নিয়ে পৃথিবীজোড়া বিতর্কের অন্ত নেই। বহু যুগ ধরেই মানুষ চেষ্টা করেছে বর্ষার জল সংরক্ষণ করে শুখা মরশুমে সেচের জল হিসেবে ব্যবহার করতে। পরে সংরক্ষিত জল বিদ্যুৎ উৎপাদন, গৃহস্থালির চাহিদা মেটানো, মৎস্য চাষ ইত্যাদি কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম পর্বে বাঁধগুলি ছিল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ছোট, পরে বাঁধের আকার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার হুভার বাঁধ আজও নির্মাণ-প্রকৌশলের বিস্ময়, বলা হয় ওই বিশাল বাঁধটি চাঁদ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবী জুড়ে বহু বাঁধ নির্মিত হয়। ২০০৯ সালে নির্মিত চিনের থ্রি গর্জেস ড্যাম বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম জলাধার যা ৪০০০ কোটি ঘনমিটার জল ধারণ করতে পারে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর চোখে বড় বাঁধ ছিল উন্নয়নের প্রতীক। তিনি ভেবেছিলেন ''বড় বাঁধগুলি হবে ভারতের উন্নতির দেবালয়''। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ, ১৯৬২ সালে চিনের সঙ্গে এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের যুদ্ধের ধাক্কায় জাতীয় অর্থনীতি তখন বিপর্যস্ত। দেশজোড়া খাদ্যসংকট সামাল দিতে আমেরিকা থেকে জাহাজ বোঝাই করে গম আসছে কিন্তু সবার ক্ষুধা মিটছে না। সুতরাং উৎপাদন বাড়াতে হবে আর সেইজন্য চাই সেচ-ব্যবস্থার প্রসার। স্বাধীনতার পরেই ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নয়নের ধারা মেনে শুরু হল নদী-শাসনের এক নতুন যুগ। টেনিসি প্রকল্পের অনুসরণে ডিভিসি ছাড়াও তৈরি হল ভাকড়া-নাঙাল ও হিরাকুঁদ। দেশজুড়ে বহু নদীর বহমান ধারাকে বন্দি করে তৈরি হল ৪ হাজারের বেশি বড় বড় বাঁধ। প্রায় সবার অলক্ষে জলাধারের নীচে তলিয়ে গেল অন্তত চারকোটি মানুষের বাস্তুভিটে। এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে জলধারের নীচে যত জমি তলিয়ে গেছে তার মোট আয়তন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আয়তনের প্রায় সাত গুণ। ভারতে জলাধার নির্মাণের জন্য যাঁরা উদ্বাস্তু হয়েছেন তাঁরা প্রায় সবাই জনজাতি বলা যায়। তাঁরা তথাকথিত উন্নয়নের বলি। ১৯৪৮ সালে ওড়িশার হিরাকুঁদ বাঁধের জন্য বাস্তুচ্যুত মানুষদের উদ্দেশে নেহেরু বলেছিলেন, আপনাদের দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগ করতে হবে। ১৯৪৮ সালে নেহেরুর পাশে দাঁড়িয়ে যে জনজাতি রমণী ডিভিসি জলাধারের উদ্বোধন করেছিলেন তাঁর কথাও কেউ মনে রাখেনি। নেহেরুর সহকর্মী মোরারজি দেশাই-এর উক্তি আরো নির্মম। ১৯৬১ সালে হিমাচল প্রদেশের বিপাশা নদীর উপর একটি বাঁধের নির্মাণকালে সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুত মানুষদের দেশাই বলেছিলেন- জলাধারটি নির্মিত হলে আমরা আপনাদের ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলব। যদি আপনারা চলে যান তো ভালো, অন্যথায় আমরা জল ছেড়ে আপনাদের ডুবিয়ে দেব। শুধু মানুষেরই ক্ষতি হয়েছে এমন নয়, জলাধারের নীচে তলিয়ে গেছে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, হারিয়ে গেছে জীববৈচিত্র। বাঁধ নির্মাণের পর একদিকে যেমন জলাধারে ক্রমাগত পলি জমেছে, অন্যদিকে ভাটির দিকে নদীখাত ক্রমাগত শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাঁধ থেকে ছাড়া উদ্বৃত্ত জলে ভেসে গেছে গ্রামের পর গ্রাম। তবু এসব ঘটনা উন্নয়নের রূপকারদের মনে কোনো দাগ কাটেনি। দি ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন লার্জ ড্যাম-এর পূর্বতন প্রেসিডেন্ট থিও ভ্যান রোরোইক বলেছিলেন— We need large dams and we are not going to apologize for it. Those in the developed countries, who already have everything put stumbling blocks in our way from the comfort of their electrically lit and air conditioned homes....The third world is not ready to give up the construction of large dams, as much for water supply and flood control as for power...Hydropower is the cheapest and cleanest source of energy, but environmentalists don't appreciate that. Certainly large dam projects create local resettlement problems, but this should be a matter of local not international concern.

কিন্তু রোরোইক-এর উক্তি প্রসঙ্গে অন্য কিছু কথাও বলা প্রয়োজন। প্রথমেই আসা যাক নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে। সব জলাধারের ধারণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সাধারণত জলাধারে তিনটি স্তরে জল রাখা হয়। নীচের স্তরটির নাম ডেড স্টোরেজ, যেখানে পলি জমে এবং ওই জল ব্যবহার করা যায় না। মধ্যবর্তী স্তরটির নাম লাইভ স্টোরেজ–যেখানে সেচের জল সংরক্ষণ করা হয়। জলাধারের একেবারে উপরের স্তরে অতিবৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, ডিভিসি কর্তৃপক্ষ জুলাই-অগস্ট মাসে জলাধার পূর্ণ করে রাখে, কারণ সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টি অনিশ্চিত–হতে পারে বা নাও হতে পারে। হলে পূর্ণ জলাধার থেকে উদ্বৃত্ত জল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তখন জলাধার থেকে ছাড়া জল আর ভাটি এলাকার বৃষ্টির জল মিশে বড় বন্যা ডেকে আনে, যেমন ঘটেছিল ১৯৭৮ ও ২০০০ সালে। আরও একটি কথা হল, একই জলাধারের জল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের কাজ করা যায় না। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলাধার থেকে ক্রমাগত জল ছাড়তে হয়, ফলে সেচের জন্য বৃষ্টির জল শুখা মরশুম পর্যন্ত জমিয়ে রাখা যায় না। বর্তমানে ডিভিসি যে শক্তি উৎপাদন করে তার প্রায় ৯৫% তাপবিদ্যুৎ। জীবনের শেষ পর্বে বড় বাঁধ নিয়ে নেহেরুর মোহভঙ্গ হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তিমন্ত্রকের বার্ষিক সভায় তিনি বলেছিলেন–আমরা এক লোক দেখানো বৃহদায়তন প্রকল্প নির্মাণের বিপজ্জনক রোগে আক্রান্ত, আমাদের ফিরতে হবে ছোট ছোট প্রকল্পে আর সেই পথেই দেশের বৃহত্তর মঙ্গল। তাঁর সেই অনুধাবন উত্তর সূরীদের প্রভাবিত করে নি। তারপরও তৈরি হয়েছে অনেক বাঁধ। নানা প্রকল্পে টাকার জোগান দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। আর সেই বিপুল ঋণ সুদসহ শোধ করছে দেশের ধনী-দরিদ্র সবাই।

আজ সরকারি প্রতিবেদনেও স্বীকার করা হয়েছে যে বাস্তুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি আর এত মানুষের চোখের জলে নির্মিত বড় বাঁধগুলি আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। জলাধারে সংরক্ষিত জলের বেশিরভাগই বাষ্পীভূত হয়েছে বা খালের নীচের মাটি টেনে নিয়েছে, মাত্র ৩৮-৪০ শতাংশ জল সেচের কাজে লেগেছে। এই ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে মাটির নীচের জলভাণ্ডার থেকে। সেচের জলের জোগান দিতে গিয়ে ভূগর্ভ-জলের ভাণ্ডার আজ অনেক স্থানেই রিক্ত। সম্প্রতি 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা গেছে যে, ২০০২-২০০৮ সালের মধ্যে দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ১০৯ ঘন কিমি জল মাটির নীচ থেকে তোলা হয়েছে। নিবন্ধটির লেখকরা বলেছেন, এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে ওই এলাকার প্রায় ১১.৪০ কোটি মানুষ জলাভাবে বিপন্ন হবেন।

একদা সুজলা-সুফলা বাংলার কথা :

একদা জলসিক্ত বাংলার কৃষি-অর্থনীতি আজ বিপন্ন। ২০১০ সালের বর্ষাকালে রাজ্য কৃষি দফতর বলছে, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের কম বৃষ্টি হয়েছে, সেই ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে মাটির নীচ থেকে জল তুলে। তবু ১১ লক্ষ হেক্টর জমিতে খরিফ চাষ হয়নি।

জলাভাবে আরো ৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ করা যাবে না। হাজার বছর ধরে মাটির নীচে সঞ্চিত সেই জলভাণ্ডার আজ একাধারে রিক্ত ও বিষাক্ত। বিপন্ন আমরা ও আগামী প্রজন্ম। আমাদের পূর্বজরা মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা বিপুল জলসম্পদের সন্ধান পেয়েও সেই জল ব্যবহার করতেন পরিমিতভাবে। কারণ তাঁরা জানতেন, মাটির নীচের জলসম্পদের যথেচ্ছ উত্তোলনের প্রতিক্রিয়ার সুদূরপ্রসারী আঘাত লাগবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের নানা স্তরে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বেড়েছে অপ্রতিহত গতিতে, একই সঙ্গে বেড়েছে জলের চাহিদা। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ভেঙে যায় সব সামাজিক বিধিনিষেধ। নলকূপের পাইপ ক্রমশ পৌঁছে যায় মাটির গভীরতর স্তরে। বর্ষায় যতটা জল মাটির নীচে প্রবেশ করে, তার তুলনায় অনেক বেশি জল তোলার ফলে ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে, হাজার বছর ধরে জমা জলভাণ্ডার। এই ঘটনা ঘটেছে ভারতের প্রায় সর্বত্র, ব্যতিক্রম নয় একদা সুজলা-সুফলা বাংলাও। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ভূ-জল পর্ষদ জানিয়েছে, রাজ্যের ১৩টি জেলায় মাটির নীচের জলস্তর যে হারে নামছে তা গভীর উদ্বেগের কারণ। কালো তালিকায় নাম উঠেছে ৬৮টি ব্লকের। অনেক সহ্য করে প্রকৃতি এখন জানান দিচ্ছে। শুকিয়ে যাচ্ছে নদী, পলিস্তরে সঞ্চিত থাকা ফ্লোরাইড ও আর্সেনিক সক্রিয় হয়ে বিষাক্ত করে দিচ্ছে নীচের জল আর সেই জল পান করছে প্রায় দু-কোটি মানুষ।

কিন্তু কেন এমন হল? পশ্চিমবঙ্গের জলচক্রের ছবিটা এবার জেনে নেওয়া যাক। এই রাজ্যে বৃষ্টিপাতের সময় ও স্থানগত বৈষম্য লক্ষণীয়। কোচবিহার জেলায় বছরে প্রায় ৩২৭২ মিমি বৃষ্টি হয় আর পুরুলিয়াতে হয় ১৫০৭ মিমি। রাজ্যের ১৯টি জেলার গড় বৃষ্টির পরিমাণ ১৭৬২ মিমি এই বৃষ্টির ৭৫ শতাংশ বর্ষার চারমাসে হয়ে যায়। সেই সময় উদ্বৃত্ত জল, তারপর দীর্ঘ আটমাসের অনাবৃষ্টি বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। গত দুই দশকের গড় করলে দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে বছরে বৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে ৮৮ ও ৭৯ দিন। প্রকৃতির বদান্যতায় আমরা প্রতি বছর যে জল পাই তার পরিমাণ হল ১২.৯৬ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। এর থেকেই ৩.৪২ মিলিয়ন হেক্টর মিটার মাটির নীচে প্রবেশ করে আর ৮.০৪ মিলিয়ন হেক্টর মিটার বাষ্পীভবন ও বাষ্পীমোচনের মাধ্যমে বাতাসে ফিরে যায়। বলা প্রয়োজন, এ রাজ্যের মাত্র ১৩ শতাংশ এলাকা বনাঞ্চল আর প্রায় ৬২ শতাংশ এলাকা কৃষিজমি। ফলে বাষ্পীমোচনের মূল অংশ হল সেচের জল। আরও একটি বিষয় হল গঙ্গা, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা ইত্যাদি নদী প্রায় ৬০ মিলিয়ন হেক্টর মিটার জল এই রাজ্যের বাইরে থেকে বয়ে আনে। এই জলস্রোতের প্রায় ৮০ শতাংশ চলে যায় বর্ষার চার মাসে। অন্য সময় অনেক নদীই শুকিয়ে যায়। নদীর জল পানীয় হিসেবে শুধু শহরাঞ্চলের কিছু ভাগ্যবান মানুষ ব্যবহার করেন, রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ গ্রামে থাকেন। তাঁদের পানীয় জল আসে মাটির নীচ থেকে।

আমাদের জলের চাহিদা নানা ধরনের। ২০০১ সালে আমরা সারা বছরে যত জল ব্যবহার করেছিলাম তার ৭২ শতাংশ হল সেচের জল। পানীয় জল ও গৃহস্থালির চাহিদা ছিল কৃষির তুলনায় অনেক কম—মাত্র দুই শতাংশ। শিল্পের চাহিদাও মাত্র ২.৪৯ শতাংশ। সব ক্ষেত্র মিলিয়ে ওই বছর জলের মোট চাহিদা ছিল ১০.৬১ মিলিয়ন হেক্টর মিটার, ২০১১ ও ২০২১ সালে তা বেড়ে হবে

যথাক্রমে ১২.০৫ ও ১৪.৩২ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। অর্থাৎ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের জলের চাহিদা জোগানকে অতিক্রম করবে। জলের এই সংকটের সূচনা হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকের গোড়ায় যখন সবুজ ছোঁয়ায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এ রাজ্যের কৃষির প্রকৌশলও আমূল বদলে গেল। আগে কৃষকরা ফসল নির্বাচন করতেন জলের প্রাপ্যতা অনুসারে, শুখা মরশুমে এবং অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টির এলাকায় এমন ফসলের চাষ হত যাতে জল কম লাগে। সবুজ বিপ্লবের সময় থেকে খাদ্য সুরক্ষার অজুহাতে শুরু হল অন্য ধরনের চাষ, দেশজ বীজের বদলে এল নতুন বীজ যার জলের চাহিদা অনেক বেশি। শুরু হল শুখা মরশুমে বোরো ধানের চাষ। যে সময় বোরো চাষ হয় (জানুয়ারি-এপ্রিল) সেই সময় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হয় মাত্র ১২৫ মিমি অথচ ওই চাষের সেচের জন্য প্রয়োজন ১৫০০ মিমি জল। অন্যভাবে বলা যায়, এক কিলোগ্রাম বোরো ধান উৎপাদন ৪৮০০ লিটার জল লাগে, যার প্রায় সবটাই টেনে তোলা হয় মাটির নীচ থেকে। অনেকেই জানেন না বোরো ধান উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ জল খরচ হয়, তা দিয়েই দ্বিগুণের বেশি গম উৎপাদন করা যায়। এখন দক্ষিণবঙ্গের অনেক এলাকাতেই শুখার সময় অগভীর নলকূপ কাজ করে না। প্রকৃতি এখন দেউলিয়া, ফলে গভীর সংকটের মুখোমুখি রাজ্যের কৃষি-অর্থনীতি।

জলের বেসরকারিকরণ :

বিশ্বব্যাঙ্ক বলেছে ভারতে যে ভাবে জল-ব্যবস্থাপনা চলছে তা সুস্থায়ী নয়—জলের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নাকি ভঙ্গুর। তারা বলছে ভারতের জল—ব্যবস্থাপনা যেভাবে চলছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে নতুন পরিকাঠামো নির্মাণ বা এখনকার বাঁধ-জলাধার-সেচখাল ইত্যাদির দেখভালের জন্য এমন কী সমাজ-অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারের হাতে থাকবে না। তাই চাই জল-ব্যবস্থাপনার বেসরকারিকরণ। ২০০২ সালে ঘোষিত জাতীয় জলনীতিতে বিশ্বব্যাঙ্ক-এর পরামর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। নতুন জলনীতির সব থেকে উদ্বেগজনক অংশ হল জল-ব্যবস্থাপনার বেসরকারিকরণের প্রয়াস। একদিকে যেমন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে বেসরকারি উদ্যোগ ও কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টকে স্বাগত জানানো হয়েছে। ভারতের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বহুজাতিক সংস্থার মিলিত উদ্যোগে এক সোনার পাথরবাটি তৈরির চেষ্টা। বিশ্বব্যাঙ্ক পরামর্শ দিচ্ছে, উত্তর-পূর্ব হিমালয়ে আরও বড় বাঁধ নির্মাণের, অর্থের জোগান দেবে তারাই। জাতীয় জলনীতিতে এক অববাহিকার জল, অন্য অববাহিকায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারত সরকার ঘোষণা করেছে ২০১৬ সালের মধ্যে তারা দেশের সব নদীগুলিকে জুড়ে দিতে চায়। গঙ্গা - ব্রহ্মপুত্র নদীর জল নিয়ে যাওয়া হবে দক্ষিণ ভারতের খরা-প্রবণ এলাকায়। এই প্রকল্পে প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৫.৬০ লক্ষ কোটি টাকা যা স্বাধীনতা-উত্তর ছয় দশকে সেচ খাতে মোট ব্যয়ের দশগুণ। এই প্রকল্পেও টাকার জোগান দেবে বিশ্বব্যাঙ্ক, তারপর জল পরিণত হবে চড়া দামের পণ্যে। কারণ জাতীয় জলনীতিতে বলা হয়েছে এবার জলের দাম এমনভাবে নির্ধারিত হবে যাতে প্রকল্পে নিয়োজিত অর্থ ও ব্যবস্থাপনার খরচ উঠে আসে। প্রথানুগ দেশীয় জল -সংস্কৃতির রূপ-নীতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ তামাদি বলে চিহ্নিত করে নতুন জলনীতি রচিত হয়েছে যেখানে প্রকৌশল-ঔদ্ধত্যে এক নতুন জল-সমাজ তৈরির কথা বলা হয়েছে। জলের প্রাকৃতিক বৈষম্য মুছে, সমতা আনার এক অলীক স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। শাসকরা বিলক্ষণ জানেন, শুধু জলের আশ্বাস শুখা এলাকার ভোটের অঙ্ক বদলে দিতে পারে। আর সেই মতোই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জল এবার যাবে তামিলনাড়ু। অথচ অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে জলাধার ও কৃষিজমির মধ্যে দূরত্ব যত বাড়ে, জলের অপচয় তত বেশি হয়। কৃষিজমির একাংশে বা কাছে কোথাও জল সংরক্ষণ করাই শ্রেয়। এজন্য বিদেশি প্রযুক্তি লাগে না, স্বয়ংসম্পূর্ণ জল-ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে দেশজ জ্ঞানই যথেষ্ট। মূলধনের প্রয়োজনও ন্যূনতম। রাজস্থানের ঊষর অঞ্চলে গড়ে ওঠা দেশজ জলসংরক্ষণ পদ্ধতি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু এই পদ্ধতি জাতীয় জলনীতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। জল বিকল্পহীন অবিভাজ্য সম্পদ। বিশ্বায়নের আহ্বানে সেই সম্পদ বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হবে এটাই এখন স্বাভাবিক।

অন্তর্নিহিত জলের স্থানান্তর :

ফসল বা কোনো পণ্যদ্রব্যে উৎপাদনের সময় যে পরিমাণ জল খরচ হয় তাকে বলা হয় অন্তর্নিহিত জল, ইংরেজিতে ভারচুয়াল ওয়াটার। ১৯৯৭-২০০১—সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সময় নানা পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে ১৬২৫ ঘন কিলোমিটার জল স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই জল গঙ্গা নদী দিয়ে এক বছরে বয়ে যাওয়া জলের তিন গুণেরও বেশি। ১৯৯৫-৯৯ সালে ভারত থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল ১৯১.৮০ কিলোমিটার জল আর ওই একই সময়ের মধ্যে আমদানি দ্রব্যের সঙ্গে ভারতে ঢুকেছিল ১৯.৫০ ঘন কিলোমিটার জল, অর্থাৎ আমরা হারিয়েছিলাম ১৭২.৩০ ঘন কিলোমিটার জল। অন্তর্নিহিত জল বা ভারচুয়াল ওয়াটার কথাটির অর্থ এমন নয়, যে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সব জল উৎপাদিত দ্রব্য বা ফসলের মধ্যেই

থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে সামান্য পরিমাণ জল উৎপাদিত দ্রব্য বা ফসলের মধ্যে থেকে যায়। তবে যে জল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় তার অনেকটাই উৎসে ফেরে না।

যেসব দেশের জলের প্রাকৃতিক জোগান চাহিদার তুলনায় কম তারা যেসব ফসল বা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে বেশি জল লাগে সেগুলি আমদানি করে জলের চাহিদা কমাতে পারে। বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত জলের আমদানি হল জল সংরক্ষণের অত্যাধুনিক কৌশল। অনেক সময় ভূ-প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা এমনকী স্থানীয় মানুষদের প্রতিরোধের জন্যও এক স্থানের জল অন্যত্র নেওয়া যায় না; কিন্তু অন্তর্নিহিত জল সহজেই সবার অলক্ষ্যে দূর-দূরান্তে নিয়ে যাওয়া যায়। এইভাবেই প্রথম সবুজ বিপ্লবের সময় থেকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের মাটির নীচের জল অন্যত্র চলে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের খরাপ্রবণ দেশগুলি এখন তাদের জলের সংকট মোকাবিলা করছে অন্তর্নিহিত জল আমদানি করে।

কোনো দেশের বাৎসরিক জলের চাহিদা বা ব্যবহার হিসেব করার অন্য এক পদ্ধতি হল ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট বা জলের পদচিহ্ন। কোনো দেশের নাগরিকরা সারা বছরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যত জল ব্যবহার করেন তাকে বলা হয় ওই দেশের জলের পদচিহ্ন। ১৯৯৭-২০০১ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীর মানুষ যত জল ব্যবহার করেছিলেন তার পরিমাণ ৭৪৫০ ঘন কিলোমিটার অর্থাৎ একজন নাগরিকের ব্যবহৃত জলের বাৎসরিক পদচিহ্ন ছিল ১২৪০ ঘনমিটার। ভারতের নাগরিকদের জলের বাৎসরিক পদচিহ্ন ৯৮৭ জন কিলোমিটার, এক জনের ৯৮০ ঘনমিটার। তুলনামূলকভাবে মার্কিন নাগরিকের ২৪৮০ ঘনমিটার। জলের পদচিহ্নে কিছু অংশ বাহ্যিক কিছু অংশ অভ্যন্তরীণ, আমাদের খাদ্যশস্য ও ব্যবহৃত পণ্যদ্রব্যের যে অংশ দেশের ভিতরে উৎপন্ন হয় এবং ওই দ্রব্য উৎপাদনে যে পরিমাণ জল লাগে তার মোট পরিমাণ হল অভ্যন্তরীণ পদচিহ্ন। আর যেসব দ্রব্য ও শস্য আমদানি করা হয় তার উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত মোট জল হল বাহ্যিক পদচিহ্ন। ভূ-উষ্ণায়নের ফলে যখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে জলের সংকট গভীর হচ্ছে, তখন উন্নত দেশগুলি চাইছে অভ্যন্তরীণ পদচিহ্ন কমিয়ে বাহ্যিক পদচিহ্ন বাড়াতে, যাতে দেশের ভিতরের জল সংরক্ষণ করা যায়।

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব কেন পূর্ব ভারতে :

নিম্ন-গঙ্গা সমভূমি তুলনাহীন উর্বর এবং প্রকৃতির নিয়মেই জলসিক্ত। এমন সমৃদ্ধ এলাকা ভুবনীকরণের কারবারিদের নজর এড়িয়ে যাবে না এটাই স্বাভাবিক। এই এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের টানে বেনিয়ারা বার বারে হানা দিয়েছে– সেই অতীত থেকে। এখন সময় বদলেছে, বাজার–অর্থনীতি পরিবেশের ভারসাম্য বা আগামী প্রজন্মের স্বার্থ ইত্যাদি বিষয় গ্রাহ্য করে না, মুনাফাই এখন শেষ কথা। ২০০৩ সালে ভারত সরকার চেয়েছিল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মহানদী অববাহিকা থেকে ১৭৩০০ কোটি ঘনমিটার জল দক্ষিণ ভারতের খরা-প্রবণ এলাকায় নিয়ে যেতে, প্রবল জনমতের চাপে কিছুটা পিছু হটে সরকার এখন কৌশল বদলেছে। এবার পূর্ব ভারতের জল দেশান্তরে যাবে ফসলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে। বহু ব্যবহারে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকার মাটি এখন অনুর্বর ও লবণাক্ত, মাটির নীচের জলসম্পদ নিঃশেষ হওয়ার মুখে–এবার চাই নতুন কৃষি-এলাকা। তাই এবার লক্ষ উত্তর-পূর্ব ভারত। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা (ক্যাম্পম্যান ২০০৭) থেকে জানা গেছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিবছর খাদ্যশস্যের বাণিজ্যের সঙ্গে প্রায় ১০৬ ঘনকিমি জলও চলাচল করে। এই জল ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত মোট জলের ১৫%। সব থেকে বেশি জল চলে যায় পাঞ্জাব-হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশে মোট উৎপাদিত গম ও ধানের যথাক্রমে ৫২ ও ৪৮ শতাংশের উৎপাদন হয় পাঞ্জাবে।

প্রথম সবুজ বিপ্লবের সময় থেকে দেশের চিরাচরিত কৃষি বদলে, পাঞ্জাব-হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশের মতো কম বৃষ্টিপাতের এলাকায় শুরু হয়েছিল ধান, আখ ইত্যাদি এমন ফসলের চাষ, যাতে জল অনেক বেশি লাগে। এছাড়া ছিল গমের চাষ। সেই সময় থেকে উচ্চ গঙ্গা খাল, ভাকড়া-নাঙাল খাল সেচের জলের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় শুরু হয় মাটির নীচ থেকে জল তোলা। বর্ষায় যতটা জল মাটির নীচে ঢোকে তার থেকে বেশি জল টেনে তোলার ফলে এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ভূগর্ভ-জল ভাণ্ডার। যে এলাকাকে বলা হত ভারতের খাদ্য ভাণ্ডার এখন সেই এলাকাই বিপন্ন রিক্ত। ক্যান্সারে আক্রান্ত বহু মানুষ। ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে আত্মহত্যার মিছিল।

প্রথম সবুজ বিপ্লব যে তিন রাজ্যে সফল বলে দাবি করা হয়েছিল, তার সঙ্গে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের জন্য প্রস্তাবিত তিন রাজ্যের কয়েকটি বিষয় তুলনা করলে বোঝা যাবে কেন ভূমির উর্বরতা ছাড়াও জলের প্রাপ্যতা একটি মুখ্য নির্ণায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। নীচের সারণিতে ওই ৬ রাজ্যের প্রাপ্য জলসম্পদের তুলনা থেকে বোঝা যাবে কেন উত্তর-পূর্ব ভারতকে কর্পোরেট কৃষির জন্য বেছে নিতে চাইছে।

শেষ কথা :

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের পরিকল্পনা হয়েছে ভারত -মার্কিন জ্ঞান চুক্তি (২০০৫) অনুসারে। জিন-প্রযুক্তি নির্ভর এই পরিকল্পনা দেশের ভূ জীববৈচিত্রের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক তা এই নিবন্ধের বিষয় নয়–আমাদের আলোচ্য বিষয় দেশের বিপন্ন জলসম্পদের কথা। আমাদের দেশের চিরায়ত জলসংরক্ষণের ধারাটি ছিল প্রকৃতি- পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্বাধীনতা-উত্তর ছয় দশকে যা ধ্বংস হয়ে গেছে। ২০০১ সালে ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন বলেছিলেন—জলসংরক্ষণের দেশজ ধারাটিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করার অর্থ, আধুনিক বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের বিরোধিতা করা নয়, বরং আধুনিক বিজ্ঞান ও দেশজ জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে জলসংরক্ষণ করাই আধুনিকতা, তাতেই মানুষের বৃহত্তর মঙ্গল।

জলসম্পদের প্রাপ্যতা : ৬ রাজ্যের তুলনা :

রাজ্য	আয়তন	জনসংখ্যা	বৃষ্টিপাত	জলের পরিমাণ	মাথাপিছু জল [ঘন মি/বছরে]	জলের স্থানান্তর [ঘন মি/বছরে]
পাঞ্জাব	৫০৩৬২	২.৪৪	৫৫০	২৯.৬৯	৩৫৫৪	-২০.০
হরিয়ানা	৪৪২১২	২.১১	৫১১	২২.৬১	২১৭৬	-১৪.১
উত্তরপ্রদেশ	২৪০৯২৮	১৬.৬২	৮০২	১৯৩.৩৩	২৯২২	- ২০.৮
বিহার	৯৪১৬৩	৮.৩০	১১৫৪	১০৮.৬৪	৬৮৯৮	১৫.৩-
ঝাড়খণ্ড	৭৯৭১৪	২.৬৯	১০৪১	৯৫.৯৬	৪৫৮০	৯.৩-
পশ্চিমবঙ্গ	৮৮৭৫২	৮.০২	১৮৪৮	১৬৪.০৫	২০৪৬	***

*** তথ্য জানা নেই। বৃষ্টিপাত ২০০৪-০৮ সালের গড়।

২০ জুন, ২০১১ তে ডিআরসিএসসি-র বোসপুকুর অফিসে আয়োজিত আলোচনাসভার কথাসংক্ষেপ ■■

চাষবাসে মার্কিনি খবরদারি

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের নামে সরকার বর্তমানে বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক নীতি পদ্ধতি তৈরি করেছে বা করছে। এই নীতি তৈরির মদতদাতারা হলেন, ভারতীয় এবং আমেরিকান কৃষি ও খাদ্য ব্যবসায় নিয়োজিত কর্পোরেট সংস্থাগুলি। দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের নামে কৃষির বাণিজ্য ইতিমধ্যেই বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র যার প্রকৃত উদাহরণ।

প্রায় ৪০ বছর আগে শুরু হওয়া সবুজ বিপ্লবের রং এখন ধূসর। অবিবেচকের মতো সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রভাব আজ আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রযুক্তির ব্যবহার কিছুটা পরে শুরু হলেও সারা দেশসহ এখানকার উৎপাদন ব্যাপক হারে কমছে। নষ্ট হয়ে চলেছে মাটি। আর তাই নতুন দাওয়াই হিসেবে আসছে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই প্রযুক্তির প্রয়োগ হবে। সরকারি নীতিতে আমাদের রাজ্যও দ্বিতীয় বিপ্লবের অন্তর্ভুক্ত। এ বছর অন্যান্য রাজ্যের থেকে বেশি অর্থ পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। মোট বরাদ্দ ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০২ কোটি টাকা।

আর তাই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সরকার কৃষি বিষয়ক নীতি তৈরি করছে। বীজ, জল, জৈববৈচিত্র, পরিবেশ, জৈবপ্রযুক্তি, বাণিজ্য, খাদ্য সুরক্ষা ও সামগ্রিকভাবে কৃষি, কী নেই এই নীতিগুলির মধ্যে। কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যকে উৎসাহ দেওয়ার এই নীতি ভারতের চাষ-ব্যবস্থা ও চাষিকে নাজেহাল করে তুলছে। এতে ক্রমশ চাষ থেকে, তাদের বংশানুক্রমিক পেশা থেকে তারা দূরে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী ২০১০ সালের মধ্যে প্রায় ২০ কোটি গ্রামের মানুষ কাজের তাগিদে, শহরের আশেপাশের বস্তিতে বসবাস করবে। হয়েছেও তাই।

যে কোনো রঙের রাজনৈতিক দলই মদতদাতা এইসব নীতির। ফলত কৃষি কর্পোরেটগুলির কাছে এক মধুময় ব্যবসা। কৃষি থেকে আয় বাড়ানোর নামে শিল্প-চালিত কৃষি ব্যবসায় নাগরিকের টাকা ভরতুকি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। ফুলে ফেঁপে উঠছে কোম্পানিগুলি। মরছে চাষ। চাষ ছেড়ে পালাচ্ছে অন্য কাজের সন্ধানে। আর এটাই চাওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে। চুক্তিচাষ, কৃষিপণ্যের আগাম বাণিজ্য, চাষের জমি ইজারা বা লিজ, চাষের উৎপাদন সারাসরি কিনে নেওয়ার চুক্তি, বড় বড় বিশেষ কৃষি বিপণন কেন্দ্র —এসবই চাষিকে জমি থেকে উৎখাত করার প্রক্রিয়া।

শিল্প-চালিত কৃষির জন্য আইন সংশোধনের কাজ চলেছে অথবা আসছে নতুন আইন। বীজবিল, অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, জৈব-প্রযুক্তি বিল, কৃষি উৎপাদন বিপণন আইন ইত্যাদি এর মধ্যে কয়েকটি, যা সংশোধন ও প্রণয়ন করে চলেছে আম আদমির সরকার, খাস আদমিদের জন্য।

বিশ্বব্যাঙ্কের কৃষি মডেল অনুযায়ী শিল্প-চালিত কৃষিতে এ যাবৎ প্রচুর বিনিয়োগ করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র সরকার। যার ফলে লাখ লাখ গ্রামীণ জীবিকা আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এই তিন রাজ্যে চাষিদের আত্মহত্যাও ক্রমশ বাড়ছে। এই রাজ্যগুলিতে বিদেশি অর্থ সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির পৃষ্ঠপোষকতার কৃষি বাণিজ্যের রমরমা অবস্থা। অন্ধ্রপ্রদেশের মিশন ২০২০ নথিতে বলা হয়েছিল, সে রাজ্যে চাষির সংখ্যা ৭০ থেকে ৪০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। হচ্ছেও তাই। কিন্তু বাকি ৩০ শতাংশ চাষি যারা জমি, চাষ থেকে উৎখাত হবে, তারা কোথায় যাবে তা নিয়ে একটি কথাও বলা হয়নি।

মার্কিন দেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ, ইন্দো-ইউ-এস নলেজ ইনিশিয়েটিভ ইন এগ্রিকালচারাল রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নামে ১০০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প শুরু করেছেন। সেখানেও অনেকটা অংশ জুড়ে আছে দ্বিতীয় সবজ বিপ্লবের কথা। ২০০৫ সালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং জর্জ বুশ ফার্ম টেকনোলজি এগ্রিমেন্ট নামে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। সে সময় মার্কিন দেশের দুই আইন সভার একটি অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে মনমোহন সিং বলেছিলেন, সবুজ বিপ্লব অগণিত ভারতীয়কে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিয়েছে......আমি খুশি। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও আমি কৃষিক্ষেত্রে যৌথভাবে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারত-মার্কিন যৌথ কর্মসূচি নিয়েছি।

এরই বহিঃপ্রকাশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব। পশ্চিমবঙ্গ যার প্রধান লক্ষ্য। কৃষিজীবী উৎখাতের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া প্রতিহত করতে এ রাজ্যের মানুষ বিশেষত কৃষকসমাজ মানুষ কতটা লড়াই চালাতে পারে এখন সেটাই দেখার।

প্রাক্ খরিফের মাঠ

এই মরশুমে মাঠে এক ধরনের ধানচাষ নিয়ে পরীক্ষা হবে। এই ধরনের ধানচাষের নাম 'বলন'। গত মরশুমেও এই বলন হাতে কলমে করা হয়েছে। ফলও ভালোই পাওয়া গেছে। এই কাজ বিভিন্ন জেলায় আরো করে দেখা হবে।

বীজতলা থেকে চারা তুলে আবার একটা জমিতে রোপণ করে, সেই জমি থেকে তুলে মূল জমিতে রোপণ করে যে ধানচাষ, তাকেই 'বলন' বলা হচ্ছে।

এই পদ্ধতিতে মূল জমিতে ধান রোপণ করা হয় ১ কাঠি করে। এই পদ্ধতিতে কেবল আমন মরশুমের ধানেরই চাষ হয়। 'বলন' পদ্ধতিতে এক কাঠা বীজতলা করতে ২-৩ কেজি বীজের দরকার হয়। বীজতলা থেকে বলনতলার জমির পরিমাণ ৩-৪ গুণ বেশি হবে। বলনতলায় চারা ৪-৫ ইঞ্চি অন্তর ১০-১২ গুছি করে রোপণ করা হয়। চারা রোপণ করতে হয় ৪-৫ ইঞ্চি কাদার। কাদার গভীরতা তার চেয়ে বেশি হবে না। জমিতে ভালো করে কম্পোস্ট ও ছাই দিতে হয়। জমি থেকে নিয়ে মূল জমিতে চারা রোয়া হয় ৩০-৩৫ দিন পর।

এক বিঘা জমির বলন-তলা থেকে ১০-১২ বিঘা অব্দি জমির ধান করা যায়। মূল জমিতে চারা বোনা হয় ১ কাঠি করে।

গত মরশুমে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই পদ্ধতিতে চাষ হয়েছে। এবার দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনায় করা হবে। উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের ৪টি জমিতে ও দঃ ২৪ পরগনা বাসন্তী-পাথরপ্রতিমার ২০টি জমিতে এবার বলনের পরীক্ষা হবে। ■■

যোগাযোগ :
৯৪৩৩৩৯০৮২৯১।৯৮৩৬৯৫২৩৮১
প্রতিবেদন : দেবব্রত গুছাইত

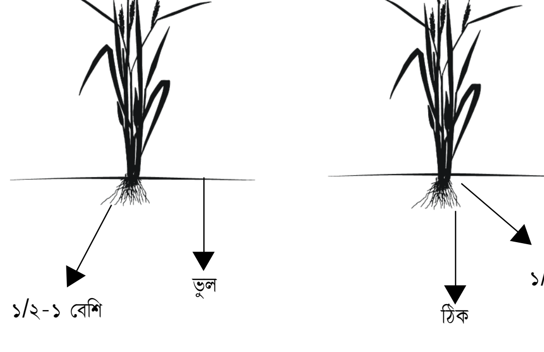

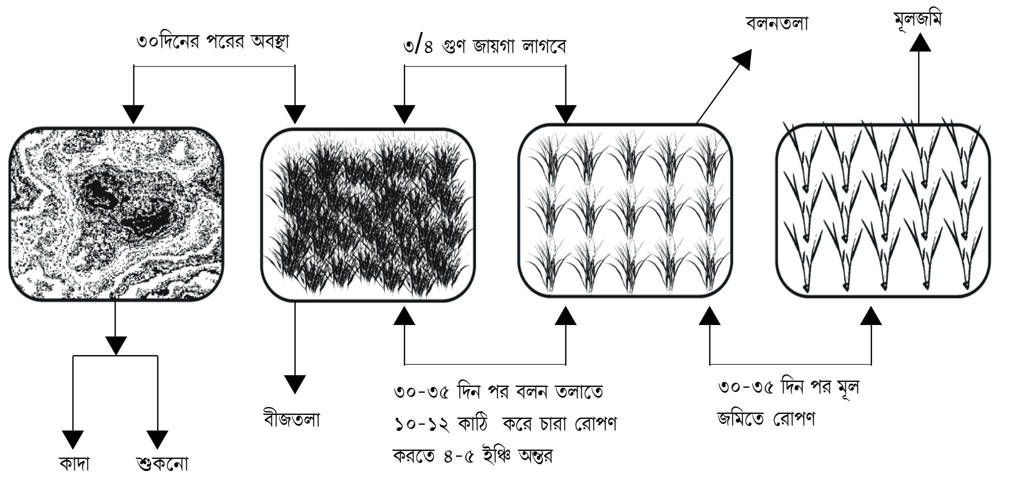

গাঢ় সবুজ বিপ্লব !

‘দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব’ নিয়ে একটা ছিপছিপে বই বেরিয়েছে। বইটার নাম **খিদের সাতকাহন ও সবুজ বিপ্লবের ছলাকলা**। বইটা লিখেছেন সুমনকল্যাণ মৌলিক। বার করেছে বিকল্প।

বইটায় দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের বিশ্ব-প্রেক্ষিত বলা আছে। সেখানে মেক্সিকো-ফিলিপাইন্স-আফ্রিকার কথা বিস্তারিতভাবে বলা আছে। প্রথম সবুজ বিপ্লব নিয়ে আলোচনা আছে। প্রথম সবুজ বিপ্লব নিয়ে একেবারে ভাগে ভাগে বলা আছে, যেমন সবুজ বিপ্লব-ফিরে দেখা, সবুজ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট, সবুজ বিপ্লবের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ, সবুজ বিপ্লবের দেশে

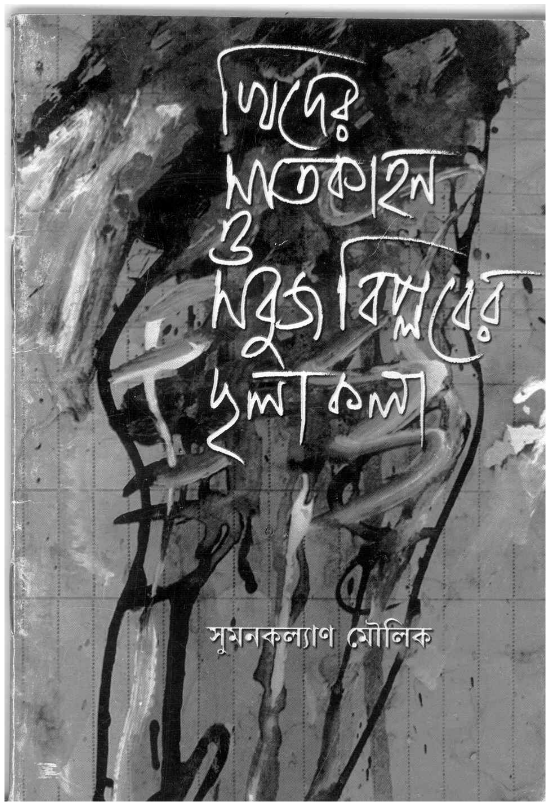

প্রসদ

ফলাফল—এইভাবে একেবারে পর্ব ধরে ধরে। আবার ভারত-মার্কিন জ্ঞান চুক্তি (AKI বা IUKAERSCL), ইন্দো-মার্কিন CEO ফোরাম আর BRAI নিয়ে আলাদা আলাদা করে বলা আছে। সবকিছুই বেশ তথ্য, সন-তারিখ ও সারণি দিয়ে দিয়ে। এর মধ্যে, দেশে খাদ্য গ্রহণের পরিসংখ্যান [পৃ.৫] ও ২০০৮-১০-এর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও কৃষি-উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির সারণির [পৃ.২৮,পৃ.৩০] কথা বলতেই হয়।

বইটার পাতা সংখ্যা ৩২। ম্যাপলিথো কাগজে পরিচ্ছন্ন ছাপা। প্রচ্ছদ করেছেন সৌমিক।

আগ্রহীজন যোগাযোগ করতে পারেন বিকল্পের ৯৮৩০০১৫৫৯৮ নম্বরে কিংবা দে বুক স্টোর, বুকমার্ক, বইচিত্র বা বইকল্পে। বইটা পেতে পারেন আমাদের লাইব্রেরিতেও।

■■ অনিকেত

খিদের সাতকাহন ও সবুজ বিপ্লবের ছলাকলা
প্রকাশক : বিকল্প, ৪২ স্কট লেন, কলকাতা ৯, প্রসূন ভৌমিক
দূরভাষ : ৯৮৩০০১৫৫৯৮, দাম ১৫ টাকা।

দ্রব্যগুণ

ব্রাহ্মী শাক

Bacopa monnieri (Scrophulariaceae)

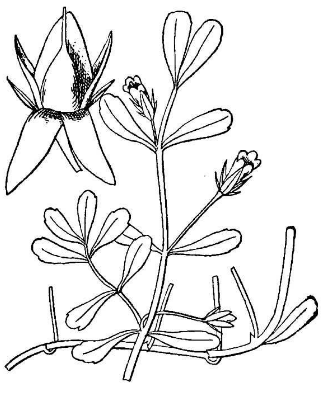

ব্রাহ্মী শাক খেতে তেতো লাগে। এটা ঘি দিয়ে ভেজে ভাতে মেখে খাওয়া পাতে প্রথমেই খেতে হয়। ওষুধ হিসেবে এটা খুব উপকারী। গলা ভেঙে গিয়ে কথা বলতে কষ্ট হলে, মৃগী হলে, স্নায়ুর দুর্বলতায়, সর্দি বুকে বসে গেলে, স্মৃতিশক্তি বাড়াতে এবং উচ্চ রক্তচাপে এর রস চা চামচের ২ -৪ চামচ মধু সহ পান করলে খুব উপকার হয়। প্রয়োজনে দিনে ২-৩ বার খাওয়া যায়। ছোটদের বুকে কফ বসে গিয়ে কষ্ট হলে, চা চামচের ১ চামচ রস মধু দিয়ে খাওয়ালে অল্প পায়খানা হয়ে সর্দি বের করে দিয়ে ভালো করে দেয়। ■■

সূত্র : বাংলার শাক

সৌর লন্ঠন

বিকল্প

বীরভূমের নারায়ণপুর সৌর লন্ঠন নিয়ে একটা কাজ হয়েছে। নারায়ণপুর গ্রামে ১৬ টা পরিবার থাকে। ১৬টা পরিবারই তফশিলি জনজাতির। এখানে রাতের আলো বলতে ছিল হ্যারিকেন। এই হ্যারিকেনের জন্য কেরোসিন লাগত। এই কেরোসিন কিনতে হত লিটার প্রতি ৩০-৪০ টাকায়। তার থেকে আলোও খুব বেশি হত না। এই–হ্যারিকেনে যেমন আলো হয় আর কী?

এখানে ১৬টি পরিবারেই সৌর লন্ঠন ব্যবহার শুরু হয়। পরিবার প্রতি একটি করে লন্ঠন। চার্জ ফুরোলে লন্ঠনে চার্জ দিতে ওখানে একটা চার্জ স্টেশনও বানানো হয়। এই স্টেশনে চার্জ দেওয়ার জন্য রাখা হয় ৬০ ওয়াটের দুটো সৌর প্যানেল। এমন ব্যবস্থা যাতে একসঙ্গে একই সময়ে ১৬টা লন্ঠনে চার্জ হতে পারে।

ছবি : সৌমজিত ভড়

সৌর লন্ঠনের ফলে ঘরে ঘরে কেরোসিন খরচ কমেছে। আগে হ্যারিকেন জ্বালাতে পরিবার-প্রতি কেরোসিন লাগত ২ থেকে আড়াই লিটার। এখন সেই খরচের বদলে আলো-প্রতি পরিবারে বাঁচছে ৭০-১০০ টাকা। আলো জ্বালানোর পুরো ব্যবস্থাটার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমস্ত পরিবার মাসে মাসে ঘর প্রতি ২৫ টাকা করে জমাচ্ছে। কেবল তাই নয়, চাহিদা কমে যাওয়ায় খোলা বাজার থেকে চড়া দামে কেরোসিন কেনাও বন্ধ হয়েছে। সৌর লন্ঠনের সুবিধে পেয়ে ওই গ্রামে এখন একটা নৈশ কোচিংও শুরু হয়েছে।

এই উদ্যোগ গড়ে উঠেছে ডিআরএসসি ও নারায়ণপুরের জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সহযোগিতায়। ■■

প্রতিবেদন : সৌমজিৎ ভড়

ছবি : সৌমজিত ভড়

গ্রাম স্বরাজ !

তৈরি হল ‘আলগি’-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা। তৈরি হয়েছে গত ১৩ মার্চ কলকাতায়। ‘আলগি’ মানে অ্যাসোসিয়েশন অফ লোকাল গর্ভনেন্স অফ ইন্ডিয়া। ‘আলগি’ তৈরি করেছে দিল্লির ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্স ২০০৭ সালে।

অন্য রাজ্যের মতো ‘আলগি’-পশ্চিমবঙ্গেরও কাজ হবে ‘স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠায় যেসব সংগঠন ও কর্ম-ব্রতী কাজ করছেন তাদের নিয়ে সমন্বয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অভিজ্ঞদের সঙ্গে ভাব বিনিময়, পঞ্চায়েত ও পুরসভার সময়মতো নির্বাচনের পক্ষে তদ্বির, ভোটারকে সচেতন করা, স্থানীয় সরকারে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে সওয়াল, জাতীয় স্তরে, গ্রাম স্তরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণে উদ্‌যোগ ইত্যাদি।

আগ্রহীজন যোগাযোগ করতে পারেন, হতে পারেন সদস্য। কলকাতায় যোগাযোগ কেন্দ্র, লোক কল্যাণ পরিষদ, ২৮।৮ লাইব্রেরি রোড—কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে। ফোনে যোগাযোগ, স্বপন মণ্ডল ৯২৩৩২৩১২০৯।

রাজস্থানেও

রাজস্থানের চাষিরাও জিনশস্য চাইছে না। তারা চাইছে রাজস্থান সরকার জিনশস্যের পরীক্ষার প্রস্তাবে সায় না দিক। রাজস্থানে মনস্যান্টো সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে রাজ্যে জিনশস্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে চাইছে। চুক্তিপত্রে জিনশস্যের পরীক্ষা সহ এই শস্যের উৎপাদন ও বন্টনের কথাও আছে। রাজস্থান কিষান সেবা সমিতি মহাসঙ্ঘ ও সেন্টার ফর কমিউনিটি ইকনমিক্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট কনসালট্যান্টস সোসাইটি যৌথভাবে এর প্রতিবাদে সোচ্চার।

মৃত্যুঞ্জয় !

পরিবেশ রক্ষায় আত্মাহুতি দিলেন স্বামী নিগমানন্দ। এই ঘটনা উত্তরাখণ্ডের। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে হিমালয়ান স্টোন ক্র্যাশার প্রাইভেট লিমিটেড নাগাড়ে পাথর ভাঙা ও নদী থেকে বালি তোলার কাজ করেছে। কাজ করতে গিয়ে পরিবেশের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। আশ্রমের স্বামী নিগমানন্দ এর প্রতিবাদে আমরণ অনশনে বসেছেন। ১৩ জুন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যার অভিযোগ এসেছে। অভিযোগের সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছে।

থাইল্যান্ড পারে...

থাইল্যান্ডের সরকার ‘রাইস মাস্টার প্ল্যান’ তৈরি করেছে। প্ল্যানের উদ্দেশ্য, ধানকে জিন-প্রযুক্তির কবল থেকে মুক্ত রাখা। এই প্ল্যানের মেয়াদ চলতি বছর থেকে ২০১৫ অব্দি। থাইল্যান্ড ২০০৭ থেকেই ধানকে জিন-কারিগরির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নিয়ে চলেছে।

গ্রিন না ফ্যাকাশে ?

ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল আপাতত দিল্লিতেই বসবে। পরে কয়েকটি বড় শহরে ট্রাইবুনালের পরিধি বিস্তৃত হবে। পরিবেশনাশ আটকাতে, কোন্ গ্রামীণ নাগরিক বিপুল ব্যয় করে কীভাবে দিল্লি গিয়ে নালিশ করবে, এখন সেটাই বড় প্রশ্নচিহ্ন।

কী কায়দা !

তৈরি হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ নিউ ভ্যারাইটিজ অফ প্লান্টস। তৈরি করেছে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ নিউ ভ্যারাইটিজ অফ প্লান্টস। এই সংগঠনের কাজ বাণিজ্যমুখী বীজ উৎপাদন-উদ্যোগের সহায় হওয়া, চাষির বীজ-অধিকারকে অস্বীকার করা। ভারত এই সংগঠনের সদস্য নয়। তবে সদস্য করার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ আসছে।

অন্য খবর

জলও যাবে ?

যোজনা আয়োগের বৈঠকে জল-সম্পদ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে আনার কথা উঠল। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা রচনার জন্য এই বৈঠক বসেছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন জলকে নিজের কর্তৃত্বে আনার আইনে বেঁধেছে। যোজনা আয়োগও সেই পথ ধরতে চায়। বিশ্বব্যাঙ্কও গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে ভারতকে সেই কথাই বলছে।

সিভিল সোসাইটি প্রথমাবধি এর বিরোধী। তাদের মতে জল জনগণের, তাই জল ব্যবহার ও বন্টনে সাধারণের সিদ্ধান্ত ও মতামত সর্বাগ্রে গুরুত্ব পাবে। এই বিরোধিতার পুরোভাগে আছে দিল্লির সেন্টার ফর ওয়াটার পলিসি।

কোথায় চাষ ?

অন্ধ্রপ্রদেশের অচন্তা গ্রাম একসময়ে দেশে ধান উৎপাদনে শীর্ষে ছিল। সেই অচন্তার চাষিরা এখন ধান চাষে নারাজ। চাষের খরচ বৃদ্ধি এর কারণ। চাষবাসের খরচ বহুগুণ বেড়েছে, কিন্তু ন্যূনতম সহায়ক মূল্য চাষি পাচ্ছে না। এর সঙ্গে অচন্তায় যোগ হয়েছে ফসল মজুত-ব্যবস্থার অভাব ও ক্রেতার অভাব।

হিম অচল !

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হারের থেকে বেশি হারে হিমালয় গরম হচ্ছে। এক সমীক্ষায় এইসব তথ্য এসেছে। ‘কারেন্ট সায়েন্স’ পত্রে সমীক্ষাটা বেরিয়েছে। হিমালয়ের ৬০০ থেকে ২২০০ মিটারের উচ্চতার সমীক্ষাটি হয়েছে। দেখা গেছে, ফল ও ফুল ফোটার সময়ের বদল হয়েছে। দেখা গেছে আদা-আলু-শিম-এর মতো অর্থকরী ফসলের উৎপাদন কমেছে। নাশপাতি গাছে ফল ধরছে জুলাই মাসের বদলে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। ইউপ্যাটোরিয়াম নামের আগ্রাসী আগাছা দেখা দিচ্ছে ১৮০০ মিটার উচ্চতায়, আগে যা দেখা যেত ১০০০ মিটার উচ্চতায়।

শ্যাওলার ক্ষমতা

রাসায়নিক-নির্ভর চাষবাসে চাষ জমি থেকে জল বর্ষায় গড়িয়ে এসে নদী-জলাশয়ে পড়ছে। নদী-জলাশয়ের দূষণ হচ্ছে। ফলে নদী জলাশয়ের জীব বৈচিত্রের ক্ষতি হচ্ছে। এই ক্ষতির পেছনে নাইট্রেটের একটা ভূমিকা আছে।

জলের এই নাইট্রেট-দূষণ রোধ করতে পারে শ্যাওলা। শ্যাওলা জল শোধন করতে পারে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্র্যাডলি কার্ডিনাল এসব বলেছেন। ব্র্যাডলি বলেছেন, জলে বিভিন্ন প্রজাতির শ্যাওলা একসঙ্গে থাকলে জলের এই দূষণ দূর করা সহজ হবে।

ভুল হয়েছে

মার্চ-এপ্রিল সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি কমিশন...’ লেখা হয়েছে। বদলে পড়তে হবে ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠিত কৃষি কমিশন’।

‘রসদ’ অংশের পুস্তক পরিচয়ে নন্দলাল বসুর কাঠখোদাই-এর বদলে পড়তে হবে লিনোকাট। উভয় ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। ■■

সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
হরফ : শিপ্রা দাস রূপ : অভিজিত দাস
মুদ্রাকর : লক্ষ্মীকান্ত নস্কর

Book Post
Printed Matter

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত ¯া কর্তৃক ১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc@vsnl.com, www.drcsc.org
DL No. 92/3.11.95